দ্রব্যগুণ

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

রাস্তা পার হতে গিয়ে চোখে পড়ল উল্টোদিকে দেশপ্রিয় পার্কের রেলিঙে কিছু ছবি ঝোলানো। সারি সারি কুড়ি-পঁচিশটা ছবি—কোনোটা প্রাকৃতিক দৃশ্য বলে মনে হচ্ছে, কোনোটার মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু একটা ছবির পাশে দাঁড়ানো একজন বুড়োগোছের ভদ্রলোককে আরো বেশি করে নজরে পড়ল কেন বলতে পারব না। এক-একজন লোকের ভিড়ের মধ্যেও দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষমতা থাকে, যেমন টোনি গ্রেগ। ইনি মনে হচ্ছে সেইরকম একজন।

বাস স্ট্যান্ডের ছাউনিতে দাঁড়িয়ে আড় চোখে লক্ষ করতে লাগলাম। ধুতি-পাঞ্জাবি দেখে মনে হচ্ছে বিয়েবাড়িতে চলেছেন কোঁচার পাড়টা কোঁচকানো-কোঁচকানো। মায়ের অ্যালবামে ছবি দেখেছি দাদুর বাবার—ঠিক ঐরকম ধুতি পরা। শুনেছি তিনি বিকেলে হাইকোর্ট থেকে ফিরে এক ঘণ্টার জন্যে ধুতি পরতেন, সেইজন্য চাকর সারাদিন ধরে একটি ধুতি কোঁচাত, যদিও একবার পরা হয়ে গেলে উনি সেই ধুতি আর দ্বিতীয়বার পরতেন না। এই ভদ্রলোককে দেখে মনে হচ্ছে মায়ের দাদুর বন্ধু হলে মানাত। সোজাসুজি অভদ্রের মত না তাকিয়ে আড়চোখে যতটা সম্ভব পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। খুব ফর্সা লোকটি, চুল কাঁচা-পাকা মেশানো, থাক-থাক নেমে এসেছে কানের তলা অবধি, হেভি চেহারা, তবে ভুঁড়ি নেই। চশমাও নেই, কিন্তু চোখের চাউনিটা কেমন যেন দিশেহারা-দিশেহারা।

রুনুকে বললাম, "তুই একটু দাঁড়া তো। মনে হচ্ছে কোন্ বাসে উঠতে হবে বুঝতে পারছেন না। আমি একটু বাসে তুলে দিয়ে আসি।"

এরকম ভাল কাজ করতে চাওয়ার আসল কারণ হল আমার হঠাৎ একটা গল্প মনে পড়ে গিয়েছিল। গল্পটা হল এই:—একজন বুড়ো ভদ্রলোক লণ্ডনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চাইছেন আর বলছেন ঘোড়ার গাড়িগুলো সব গেল কোথায়? আসলে তাঁর স্মৃতি লোপ পেয়ে গিয়েছিল। ঐ পাড়ার একটি ছেলে তাঁকে বাড়ি পৌঁছতে সাহায্য করেছিল। উনি মারা যাবার পর উইলে দেখা গেল ছেলেটির জন্যে সাত হাজার পাউণ্ড না কত যেন বরাদ্দ আছে। ছেলেটির সঙ্গে তাঁর পরে দেখা না-হলেও তার উপকার তিনি ঠিকই মনে রেখেছিলেন। অবশ্য ছেলেটা বুদ্ধি করে নামঠিকানা দিয়ে রেখেছিল ভাগ্যিস, তা না

হলে কিছুই হত না। পরে জানা গিয়েছিল বুড়ো ভদ্রলোক বিরাট বড়লোক, অনেক কলকারখানার মালিক।

আমার দুম করে মনে হল, হয়ত ইনিও সেরকম একজন শিল্পপতি হবেন। চেহারাটা তো সেইরকমই দেখাচ্ছে। কাজের চাপে নির্ঘাত স্মৃতি লোপ পেয়ে গেছে। এই আমার সুযোগ। ওহ, হঠাৎ আমার নামে একখানা সাত হাজার টাকার চেক এলে ছোড়দি-বড়দিরা যা অবাক হবে! আমি অবশ্য হব না, কারণ আমি তো আগে থেকেই জানি।

ভাবতে-ভাবতে এক দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে গেছি। ভদ্রলোক ঠিক আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছেন, একটুও নড়েননি। মাথা নিচু করে মাটিতে কিছু খুঁজছেন মনে হল।

"আপনাকে কিছু সাহায্য করতে পারি?" খুব ভদ্রগলায় জিগ্যেস করলাম। 'দাদু' কথাটা মুখের গোড়ায় এসে গিয়েছিল। বহু কষ্টে সামলে নিলাম। দাদু বললে অনেকে বিরক্ত হন।

"না, মানে সাহায্য তুমি আমায় কী করে করবে? কিছু যদি মনে না করো, তুমি কে?"

"আমার নাম কৌশিক চক্রবর্তী, এখানেই থাকি।" প্রথমেই ঠিকানা কিম্বা বাবার নাম বলে দেওয়া ঠিক হবে না, কারণ তাহলে উনি ভাববেন আমি সাত হাজারের জন্য বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছি।

"আপনি কি কিছু খুঁজছেন?" আমি খুব সহজ গলায় জিগ্যেস করি, "পকেট থেকে মানিব্যাগ পড়ে গেছে?"

"না না না, মানিব্যাগ না—সে অনেক দামী জিনিস।" শেষের কথাগুলো বলবার সময় ও'র গলাটা ফিসফিসে হয়ে গেল। আমার কাছে ঘেঁষে এসে কাঁধে হাত রাখলেন।

"কোথায় যে ফেললাম! বাড়ি থেকে বেরিয়ে ব্যাঙ্কে গেছি, সেখান থেকে ডাক্তারের কাছে, তারপর—" বলতে বলতে থেমে গেলেন ভদ্রলোক, মুখ এই বড় হাঁ হল। "সর্বনাশ করেছে। ভুল করে কি তাহলে ব্যাঙ্কে জমা করে এলাম?"

ইতিমধ্যে রুনু রাস্তা পার হয়ে এসে হাজির। দু-চোখে কৌতূহল। সাত হাজারে ভাগ বসাতে ইনিও উপস্থিত। আর তর সয়নি! সত্যি এরকম বন্ধুবান্ধব দিনরাত ঘুরঘুর করলে কি কোনো ভাল কাজ করা যায়? একজন বৃদ্ধ লোকের উপকার করার চেষ্টা করছি, তার মধ্যেও এসে নাক গলানো চাই।

"কী জমা করে এসেছেন দাদু?"

উহ্ রুনুটার কথা শুনে তো আমার প্রেসটিজ ঢিলে। কী আবার লোকে ব্যাঙ্কে জমা করে, টাকা ছাড়া? তার ওপর 'দাদু'! স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ইনি একজন শিল্পপতি, হঠাৎ স্মৃতি লোপ পেয়েছে। এখন আমার উচিত এঁকে কোথাও চা খাওয়াতে নিয়ে যাওয়া। গল্পের ছেলেটিও তাই করেছিল। রুনু যদি আমাদের সঙ্গে সেঁটে থাকে তাহলে আবার ওকেও চা খাওয়াতে হয়। আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল।

"চলুন, একটু বসি কোথাও। তাহলে আপনার মনে পড়ে যাবে।" আমি সন্তর্পণে ও'র হাত ধরে সুতৃপ্তির দিকে পা বাড়ালাম। ভদ্রলোক আপত্তি করলেন না, আমার হাত ধরে দিব্যি বাধ্য ছেলের মত গুটগুট করে এগোতে লাগলেন। একটা সাতচল্লিশ নম্বর ঘ্যাঁক করে ঘাড়ের কাছে এসে ব্রেক দিল। উনি আমার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরলেন।

পিছনে রুনুটা ঠিক ফেউ লেগে আছে। গোটাকতক রিকশা আর একটা ষণ্ডামার্কা গোরুকে পাশ কাটিয়ে কোনমতে ওদিকের ফুটপাথে পৌঁছেছি—ঘাড়ের কাছ থেকে রুনুটা সমানে বকবক করে চলেছে। "কোন ব্যাঙ্ক আপনার? স্টেট ব্যাঙ্ক নাকি? সেখানে গেলে হয়ত মনে পড়ে যাবে।"

আমি পিছন ফিরে চোখ টিপলাম। জানি তাতে কোন ফল হবে না। ভেতরে ঢুকে বললাম, "দু কাপ চা। যেন বেশ গরম থাকে।" বলেই ভাবলাম শিল্পপতিরা কি এই সময় কফি খান? তাহলে কোনো মাদ্রাজী দোকানে গেলে হত।

রুনু সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন করে বলল "তিন কাপ।" বলেই অপেক্ষা না করে ঝড়াত করে চেয়ার টেনে বসে পড়ল। রুনুটাকে যে কত শেখাব! এও জানে না বড়দের সামনে ওরকম আগেভাগে বসতে নেই! তার ওপর ঐরকম বিশ্রী আওয়াজ।

বসে পড়ার পর ভদ্রলোককে খুব নিশ্চিন্ত মন হল। টেবিলে হাত রাখতেই অ্যাশট্রেতে আঙুল ঠেকল।

"এটা কী?" উনি একটু চমকে উঠলেন মনে হল।

"অ্যাশট্রে।"

"ওহ্, অ্যাশট্রে। আমি যদি—কী যেন নাম বললে তোমার? কৌশিক না?"

রুনু বলল, "আমার নাম গৌতম।"

"বেশ, বেশ। গৌতম আর কৌশিক। তোমরা কি এক ইশকুলেই পড়ো?"

"হ্যাঁ, তীর্থপতি।" রুনুকে সামলানো মুশকিল। এবারে নিজের ঠিকানাটা না দিয়ে বসে।

"যা বলছিলাম, আমি যদি এখন একটু সিগারেট খাই তোমাদের অসুবিধে হবে না আশা করি।" বলেই উনি দেশলাইয়ের জন্যে পকেট হাতড়াতে লাগলেন। ও'র কি পকেট থেকে সব কিছুই পড়ে গেছে? আমি তাড়াতাড়ি পাশের টেবিলের নানকুদার কাছ থেকে একটা দেশলাই চেয়ে এনে ও'কে দিলাম।

উনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। দীর্ঘনিশ্বাসের হাওয়ায় দেশলাইটা নিভে গেল।
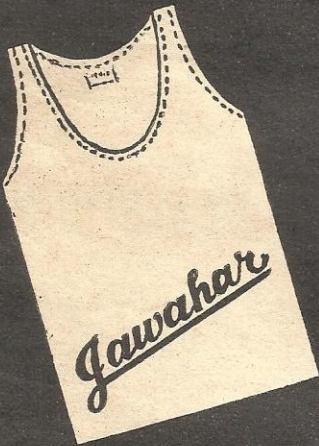
"আর সিগারেট! বলতে গেলে এই জীবনের শেষ সিগারেট। পৃথিবীর শেষ সিগারেটও বলতে পারো। কিছুক্ষণের মধ্যেই তো সব শেষ।"

সমস্তক্ষণ 'মারা যাচ্ছি, মারা যাচ্ছি' ভাবাটা এক ধরনের অসুখ। কী যেন একটা নামও আছে তার। শিল্পপতি ভদ্রলোক দেখছি এই অসুখে ভুগছেন।

রুনু ভুরু কুঁচকে ওঁকে দেখতে লাগল। আমি চুপচাপ বসে চা খেতে লাগলাম। শিল্পপতি বললেন, "ভাবতেও খারাপ লাগছে এই ভয়াবহ পরিণতির জন্য আমিই দায়ী হব। তোমাদের মত নিষ্পাপ শিশুরা—দুধের বাছারা সব—"

রুনু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমার এই মার্চে পনেরো পুরো হচ্ছে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। আরো কত স্কুলের কত ছেলেমেয়েরা—দুধের বাছারা সব—কেউ জানবে না, কেউ বুঝবে না। হঠাৎ কোথা থেকে কী হয়ে যাবে—দড়াম করে এক বিকট বিস্ফোরণে সমস্ত শহর কেঁপে উঠবে—চুরমার হয়ে পড়তে থাকবে তিনতলা, চারতলা, পঁচিশতলা সব বাড়ি—চাদ্দিকে ধুপধাপ, ঝুপঝাপ—উহ্, সে দৃশ্য মনেও আনা যায় না।"

রুনুর তো এই শুনে মুখ শুকিয়ে পামশু। আমিও পিঠ খাড়া করে বসলাম। শিল্পপতি বলে চললেন, "তোমরা আমাকে পাগল ভাবছ। মনে করছ আবোল তাবোল বকছি। তাহলে তো বেঁচে যেতাম ভাই। শুধু আমি কেন, এই শহরসুদ্ধ লোক সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে পার পেয়ে যেত। কিন্তু সে তো হবার নয়। সেই সর্বনেশে বস্তুটি নিশ্চয় এতক্ষণে তার স্বরূপ ধারণ করে ফেলার পথে।"

"বস্তু?" আমরা দুজনে সমস্বরে বলে উঠলাম।

"হ্যাঁ, বস্তু।" ভদ্রলোক মলিন হাসি হাসলেন। "বস্তুটি বড় জাগ্রত। আমার গুরুদেবের স্বপ্নে পাওয়া বস্তু—জাগ্রত না হয়ে যায় কোথায়। গুরুদেব বললেন, ওরে বেটা, এই বস্তু কোমরে ধারণ কর, তারপর প্রতি অমাবস্যার রাতে ঈশান কোণের দিকে মুখ করে এক পায়ে খাড়া হয়ে নিশ্বাসে পাঁচ বার এই মন্ত্র জপ কর,—তিন মাসের মধ্যে দেখবি কোথায় তোর ব্লাডপ্রেশার, কোথায় তোর আর্থেরাইটিস—আবার যদি কোঁচানো ধুতি পরে লেকে চক্কর দিতে না পারিস তাহলে আমি গেরুয়া ত্যাগ করে প্যাণ্টশার্ট ধারণ করব। কিন্তু একটা কথা, যদি কোন অমাবস্যায় এক নিশ্বাসে পাঁচবার মন্ত্র বলতে গিয়ে দম নিয়ে ফেলিস, তো সেদিনই বুঝবি ও-বস্তুর গুণ নষ্ট হয়েছে। সেই সুযোগে ওর মধ্যে ভর করবে সাংঘাতিক অপদেবতার আত্মা। তখন একমাত্র উপায় সক্কালবেলা উঠে ধৌত বস্ত্র পরিধান করে কাগজের মধ্যে মুড়ে দ্রব্যটিকে জলে ফেলে আসা। আমি বললাম, গঙ্গার জলে গুরুদেব? গুরুদেব বললেন, লেকের জলে হলেও হবে, মোটকথা জলে ফেলা চাই, না হলে অপদেবতার কীর্তি তো জানিস না—মুহূর্তে এক থেকে দুই, দুই থেকে চার, এই রেটে বাড়তে বাড়তে সমস্ত পৃথিবী গ্রাস করবে—আর যদি বাড়বার জায়গা না পায় তাহলে সব ফেটেফুটে চুরমার হয়ে যাবে।"

"আপনি কি সেই দ্রব্যটি পকেটে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন?" আমি ভয়ে ভয়ে জিগেস করি।

"নিয়ে যাচ্ছিলাম মানে? না নিয়ে গিয়ে উপায় আছে? করেছ কখনো অমাবস্যার রাতে এক পায়ে এক নিশ্বাসে পাঁচ-বার মন্ত্র জপ ? দম নেবার জন্যে থামতেই হবে। যাই হোক খুঁত যখন হয়ে গেল তখন ঐ অপবস্তুকে বিসর্জন দিতেই হবে এই মনে করে বেরিয়েছিলাম। বৌমা বললেন, বাবা, সাদার্ন অ্যাভিনিউ যখন যাচ্ছেন তখন আমার এই গয়নার বাক্সটা যদি ব্যাঙ্কের লকারে জমা করে আসেন—"

"তারপর?" দম বন্ধ করে আমি জিগ্যেস করলাম।

"তারপর কী জিগেস করছ? এক পকেটে বৌমার গয়নার বাক্স আর এক পকেটে সেই অপদেবতার ভর-করা দ্রব্যটি নিয়ে বেরিয়েছি, লেক হয়ে ব্যাঙ্কে যাব—"

"আপনি কি গয়না রাখতে গিয়ে সেই বস্তুটা লকারে ঢুকিয়ে এসেছেন?" রুনু এতক্ষণে রহস্যটা ধরতে পারে।

"আর আপনার বৌমার গয়না—"

আমার কথায় বাধা দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, "সেই জন্যই তো বলছি, এই আমার শেষ সিগারেট খাওয়া। আর এই যারা এক কাপ চা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়, তাদেরও এই শেষ আড্ডা মারা। এতক্ষণে অপদেবতা সেই ছোট্ট লকারের মধ্যে নিজ মূর্তি ধারণ করতে শুরু করেছেন—দুই থেকে চার, চার থেকে ষোলো, ষোলো থেকে—"

অন্যমনস্কভাবে উনি পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করতেই কী দুটো জিনিস ঠক করে টেবিলে পড়ল।

"দুটো কাঁচ। আপনার ব্যাগের গায়ে লেগে ছিল।" আমি তুলে দিতে গেলাম।

ভদ্রলোক বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন। "কই, কোথায়? দাও, দাও। ওরই জন্যে এতক্ষণ..." হাতড়ে টেনে রুমাল দিয়ে মুছে চোখের মধ্যে গুঁজলেন।

"কনট্যাক্ট লেন্স। ঐ দুটোই তো হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাই চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। ভাগ্যিস তোমরা ছিলে। তা না হলে এতক্ষণে বাসের তলায়।"

ভদ্রলোক চায়ের দাম দিয়ে উঠে পড়লেন। রুনু ভ্যাবাচ্যাকা মুখে বললেন, "এতক্ষণেও কিছু হয়নি যখন, তাহলে ব্যাঙ্কে গিয়ে একবার ট্রাই করবেন নাকি?"

"ব্যাঙ্কে কেন?"

"ঐ যে অপদেবতার ভর করা বস্তু—"

ভদ্রলোক আকর্ণবিস্তৃত হাসলেন। "ওহে খোকা, অপদেবতাকে কি কেউ পকেটে করে ঘুরে বেড়ায়? তাছাড়া আর্থেরাইটিস থাকলে আর সোজা হয়ে হাঁটছি কী করে? এতক্ষণ তোমাদের পরীক্ষা করছিলাম, তাও বুঝতে পারোনি?"

শহরে জোড়া বাঘ

গঙ্গেশ বিশ্বাস

জঙ্গলে বাঘ থাকে কে না জানে। কিন্তু জঙ্গল ছেড়ে কোন ব্যাঘ্র-দম্পতি যে শহরে জায়গা দখল করতে এগিয়ে আসে, এমন খবর নিশ্চয়ই আশ্চর্যের। না, সার্কাস বা চিড়িয়াখানা বা রূপ-কথার বাঘেদের কথা নয়, সত্যিকার জঙ্গলের বাঘ-বাঘিনীই এই বাংলা দেশেরই এক শহরে এসেছিল আস্তানা গাড়তে।

পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। কিন্তু ঘটনাগুলো আজও যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। আমার বয়স তখন বছর দশেক।

বাবা মাথাভাঙা ডাকঘরের পোস্টমাস্টার। মাথাভাঙা তখন কোচবিহার রাজ্যের একটি মহকুমা শহর। বেঙ্গল ডুয়ার্স রেল-ওয়ের পাটগ্রাম স্টেশনে নেমে ভাঙা ইঁটের রাস্তা দিয়ে সেকালের হাটুরে বাসে নয়তো গরুর গাড়িতে যেতে হত সেখানে।

দুটি নদী শহরটিকে তিন দিকে ঘিরে থাকত। পূবে মানসাই, পশ্চিম আর দক্ষিণে সুটুঙ্গা। মানসাইয়ের প্রচণ্ড ভাঙনের জন্য এখন অবশ্য শহরটি সুটুঙ্গার দক্ষিণ-পশ্চিমে সরে যাচ্ছে। বর্ষায় নদীগুলো বেশ ফেঁপে উঠলেও শীতকালে সেগুলো পায়ে হেঁটেই পার হওয়া যেত। মানসাইয়ের ওপারে প্রথমে কাশ, কুল, পানিয়াল ও বাবলার ঝোপঝাড়, তারপর শাল ও সিসুর গভীর বন। এই বনের মধ্যে ছিল কোচবিহার সদর পর্যন্ত দো-আঁশ মাটির একটি অস্পষ্ট গরুর গাড়ির পথ। বল্লমের গলায় ঝুন-ঝুনি ঝুলিয়ে দুজন ডাকহরকরা সেই পথে মাথাভাঙার ডাক নিয়ে যেত কোচবিহারে। তারা বলত, "ঝুনঝুনির আওয়াজ শুনলে তেনারা বোঝেন আমরা সরকারের লোক, তাই গোলমাল না করে নিজেরাই পথ থেকে সরে যান।" তারা আবার বুঝিয়েও দিত 'তেনারা' মানে জঙ্গলের রাজা-জমিদার, বাঘ বাইসন—এই সব।

কোচবিহার রাজ্যের মহকুমা-শাসকের পদের নাম ছিল নায়েব আহিলকার। মাথাভাঙার নায়েব আহিলকার মাঝে মাঝে হাতি নিয়ে শিকারে যেতেন মানসাইয়ের ওপারে। আমাদের স্কুলের কাছেই ছিল নায়েব আহিলকারের জন্য স্টেটের বাংলো। হাকিমের বাসার ধারে যখন বাঘের ছাল ছাড়ানো হত, আমরা বিনা বাধায় বাঘের চর্বি নিয়ে আসতাম, আর তা গলিয়ে তৈরি করতাম বাঘের তেল। বেশ মনে পড়ে, এক দিন হাকিমবাবু একটা দাঁতাল শুয়োর মেরে এনেছিলেন; সেটা এত বড় ছিল যে, তার শরীরটা একলাই গরুর গাড়ির প্রায় সবটুকু জায়গা দখল করে নিয়েছিল।

মথাভাঙায় হাট হত সপ্তাহে দুদিন—বৃহস্পতি আর রবি-বার। একবার বৃহস্পতিবারের হাটের দিনে শহরে একটি বাইসন ঢুকে পড়ে বিস্তর তোলপাড় করেছিল, শুনেছিলাম ওখানকার বয়স্কদের মুখে। আমি সেখানে থাকাকালেও এক বৃহস্পতি-বারের যে-ঘটনার সক্ষী হয়ে আছি, তেমন ঘটনার কথা কেবল গল্পের বইয়েতেই দেখা যায়।

বাড়িতে তখন কার যেন অসুখ। সকাল আটটার দিকে ডাকঘরের সামনের রাস্তায় বেরিয়েছিলাম মানসাইয়ের এপারের একটি বাড়ি থেকে কিছু কবরেজী গাছ-গাছড়া জোগাড় করে আনতে। কিন্তু কেন জানি না উল্টো দিকের একটা পথ ধরে কিছু দূর চলে গিয়েছিলাম। দেখি লাঠি-ঠ্যাঙা হাতে নিয়ে লোকজন এক দিকে ছুটে চলেছে। ব্যাপার কী না-বুঝেই রাস্তার ধার থেকে একটা বাঁশের বাতা কুড়িয়ে নিয়ে আমিও ছুটলাম তাদের পিছু পিছু। আট-দশ মিনিট ছোটার পর যতীনবাবু-উকিলের বাড়ির সামনে এসে পেঁছলাম। দেখলাম দলে দলে লোক উকিলবাবুর বাড়ির দিকে যাচ্ছে আসছে। বাড়ির কাছাকাছি পেঁছে শুনতে পেলাম আশপাশের বাড়ির মেয়েদের কান্না কাটির শব্দ। যতীনবাবুর বাড়ির বেড়া পেরিয়ে ভেতরের দিকের উঠোনে যেতে যেতে দেখলাম তিনি খালি গায়ে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসছেন। ফর্সা লম্বা স্বাস্থ্যবান চেহারা, এখন একে-বারে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত। ভাবলাম, বুঝি একটা সাংঘাতিক মারামারি হয়ে গেছে তক্ষুনি। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভুল ভাঙল, বেড়া পার হয়ে ভেতরের উঠোনে পেঁছে দেখলাম, একটা বড় চিতা বাঘ বা বাঘিনী, গায়ে প্রচুর কোপের দাগ নিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে মাটিতে পড়ে আছে। কিন্তু তখনও তার শরীরের কোন-কোন পেশীর স্পন্দন চলছে।

পাশেই ছিল আর-এক উকিল দীনবন্ধুবাবুর বাড়ি। লোকের পিছু পিছু সেই বাড়িতে গিয়ে দেখি, দীনবন্ধুবাবুও ভীষণ আহত। তিনি একটা বড় তুলোর স্তূপ ডান গালে চেপে ধরে খাটে শুয়ে আছেন, মেঝেতে একটা রক্ত-ভর্তি গামলা। পর পর আরও পাঁচ-সাত জন আহত ব্যক্তিকে দেখা গেল এই পাড়ায়। সকলেই ঘায়েল হয়েছেন বাঘের আক্রমণে। আমার হাতের বাতাটা যে কখন হাত থেকে খসে পড়েছে, টেরও পাইনি।

॥ ২ ॥

সম্পূর্ণ ঘটনার বর্ণনা দিতে গেলে একটা বই হয়ে যায়। সংক্ষেপে ঘটনা হচ্ছে, আগের দিন রাত্রিতে ঐ পাড়াতেই একটু দূরের আর-এক উকিলের বাড়িতে কোথা থেকে যেন একটা বাঘ আর বাঘিনী ঢুকে পড়ে একটা খড়ের পালার পাশে চুপচাপ বসে ছিল। সময়টা শীতকাল। অনুমান করা যায় বাঘ দুটো

নসাইয়ের ওপার থেকে নদী পেরিয়ে এসেছিল। ঘটনার দিন একটু সকালের দিকে কয়েকটি ছোট ছেলে নাকি ঐ বাড়ির বাইরে থেকে বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাঘ দেখছিল। বাচ্চাগুলো একটু বাড়াবাড়ি করতেই কর্তা-গিন্নী তাদের দখল করা জায়গা ছেড়ে দিয়ে একসঙ্গে লাফ দিয়ে বেড়ার বাইরের রাস্তায় পড়ে ; আর পড়বি তো পড় এই উকিলবাবুর এক পিওনের সামনেই পড়ল। বাঘ দুটোর একটা সঙ্গে-সঙ্গে পিওনকে আক্রমণ করল, আর-একটা রাস্তা দিয়ে সোজা দৌড়। বাচ্চাগুলো কিন্তু বেড়ার ঠিক গায়ে লেগে থাকার জন্য খুব বেঁচে গেল। একেই বলে রাখে কেষ্ট মারে কে!

কুড়ি-পঁচিশ হাত দূরে ছিল আমাদের স্কুলের ফুটবল-খেলোয়াড় মাখনদার বাড়ি। মাখনদা তাঁর এক ভাগ্নেকে কোলে করে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন অন্যমনস্কভাবে। ছুটে-আসা বাঘটা আক্রমণ করল মাখনদাকে। মাখনদা আক্রান্ত হয়েও তাঁদের বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে "দিদি বাঘ, শিগগির তোর ছেলে ধর" বলে চিৎকার করে ওঠেন; কোন রকমে দিদির হাতে ছেলেকে দিয়ে বাঘের সঙ্গে ঘরে ঢুকে পড়েন মাখনদা। সেখানে কয়েক সেকেণ্ড মাখনদার সঙ্গে লড়াইয়ের পর বাঘটা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু দুটো বাঘই অল্পক্ষণের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। এদিকে পাড়ায় হৈ চৈ পড়ে যায়—বাঘ বাঘ! যারা দূর থেকে বাঘ দুটো দেখেছিল, তারা বলাবলি করছিল বাঘ দুটো কোন দিকে যেতে পারে। যতীনবাবু তখন তাঁর কাচারি-ঘরে মক্কেল নিয়ে ব্যস্ত। বাইরের উঠোনে দুজন মজুর কুড়ুল দিয়ে কাঠ চেরাই করছে। পাড়ায় হৈ চৈ শুরু হতে দীনবন্ধুবাবুও বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। পাশাপাশি দুই উকিলবাবুর বাড়ির মাঝে ছিল গলা-পর্যন্ত-বাঁশের-বেড়ায় ঘেরা কয়েক কাঠা পতিত জমি ভাঙ গাছে ভর্তি। দীনবন্ধুবাবু সেই ভাঙ গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আঙুল দেখিয়ে বলে ওঠেন, "ওই যে বাঘ।"

এবারও শহরের জমি দখলে বাধা পেয়ে একটি বাঘ সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর ডান গালে মারে এক থাবড়া। তাতেই তাঁর ডান গালের অর্ধেকটা আলগা হয়ে যায়। দীনবন্ধুবাবুর এই দশা দেখে কাছেই দাঁড়ানো তার এক পিওন, রামখেলন, চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, "বাবুকো তো খা লিয়া!"

বাঘ সেই মুহূর্তেই দীনবন্ধুবাবুকে ছেড়ে দিয়ে নিমেষের মধ্যে রামখেলনের কব্জি কামড়ে ধরে। এই সময় যতীনবাবু কাচারিঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি কী করবেন স্থির করার আগেই বাঘটা রামখেলনকে ছেড়ে দিয়ে যতীনবাবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

যতীনবাবু ছিলেন বাঘা যতীনের মতই একজন শক্তিমান পুরুষ। বাঘ লাফিয়ে উঠতেই তিনিও তাকে জাপটে ধরেন। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কী ভাবে যেন বাঘটার মাথা চলে যায় তাঁর বগলের মধ্যে আর এই অবস্থায় তিনিও ধস্তাধস্তি করতে থাকেন বাঘটার সঙ্গে। মজুর দুজন এগিয়ে এসে মাঝে-মাঝেই বাঘটার গায়ে কুড়ুলের ঘা মারছিল বটে, কিন্তু জন্তুটার

অস্থিরতার জন্য খুব সুবিধাও করতে পারছিল না। এইভাবে কিছুক্ষণ—ক সেকেন্ড বা ক মিনিট বলা মুশকিল—চলার পর বাঘটা ছিটকে মাটিতে পড়ে যায়; কিন্তু দেখতে না দেখতে দাঁড়িয়ে উঠে আবার যতীনবাবুকে আক্রমণ করে। এবার যতীনবাবু দুহাত দিয়ে বাঘটার দুটো হাত চেপে ধরেন। মজুররা ইতিমধ্যে একটু দূরে সরে গিয়েছিল, তারা আবার এগিয়ে এসে কুড়ুল দিয়ে বাঘটাকে কোপাতে থাকে। এর পর বাঘটা যে পড়ল, আর উঠল না। এটা ছিল বাঘিনী, লেজ নিয়ে প্রায় সাত ফুট। দীনবন্ধুবাবুকে আক্রমণ করা থেকে বাঘটার মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাটা ঘটে যায় বোধহয় দশ মিনিট কি তারও কম সময়ে।

॥ ৩ ॥

বাঘিনীটা যখন দীনবন্ধুবাবুকে আক্রমণ করে, অন্য বাঘটা তখন ভাঙ-বাগান থেকে বেরিয়ে আর একটা পাড়ার মধ্য দিয়ে সোজা আধ মাইল দূরের একটা শুকনো খালের ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে গা ঢাকা দেয়। শোনা যায়, বাঘটা যখন এই পাড়ার মধ্য দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল, তার গায়ের ধাক্কা লেগে দু' তিন বছরের কয়েকটা বাচ্চা এদিক ওদিক ছিটকে পড়ে যায়।

দুপুরের দিকে বাঘটাকে মারার জন্য মাথাভাঙার হাকিম হাতি নিয়ে এগিয়ে গেলেন সেই খালটার দিকে। ডাকঘরের কাছেই ছিল খালটার শেষ মাথা, শুরুটা ছিল মানসাই নদীর দিকে। খালের এক ধার বরাবর একটা রাস্তা চলে গিয়েছিল নদী পর্যন্ত, আর এক ধারে ছিল খ্রীষ্টান মিশনারিদের জংলা পতিত জমি। সময়ের হিসেব করে দেখলে দেখা যাবে, বাঘটা যখন খালের জঙ্গলে লুকিয়েছে, ঠিক তখনই ঐ খালের ধারের পথ দিয়ে আমাকে যেতে হত গাছ-গাছড়া আনতে। বাঘটা হয়তো তখন কোন ঝোপের আড়াল থেকে আমাকেই লক্ষ করত লেজ নাড়তে নাড়তে—ওরেব্-বাবা, এখন ভাবতেও যেন শিরদাঁড়া শিরশির করে!

হাকিম যখন হাতিতে মিশনারিদের দিক থেকে ধীরে ধীরে খালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি তখন খালের মাথার ধারের একটা নিমগাছের উপরে উঠে খালের ভেতরের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম কী হয়। কতকগুলো গাছের আড়ালে পড়েছিল বলে আমি প্রথমে হাতিটা দেখতে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ পরপর দুটো বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে দেখি একটা বাঘ বিদ্যুৎ-গতিতে একটা ঝোপ থেকে আর একটা ঝোপে গিয়ে ঢুকল। খাল-ধারের রাস্তায় তখন বোধহয় হাটের অর্ধেক লোক দাঁড়িয়ে। কিছু লোক খালের দিকে ছুটে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল বোধহয় হাতি থেকে কোন ইঙ্গিত পেয়েছিল তারা। এই সময় দেখা গেল হাতিটা খুব তাড়াতাড়ি খালের মধ্যে নামছে। তখনই আর একটা গুলির শব্দ পেলাম। এবার রাস্তার লোক আবার ছুটল খালের দিকে। বোঝা গেল প্রথম দুটো গুলি খেয়েও বাঘটা ছুটে যায় পরের ঝোপে; কিন্তু সেখানে পড়ে গিয়েও আবার উঠতে চেষ্টা করে। ঠিক সেই সময় চলে তিন নম্বর গুলি।

যখন দেখলাম, বাঘটাকে বাঁশে বেঁধে উপরে নিয়ে আসা হচ্ছে, তখন আমিও নিশ্চিন্তে গাছ থেকে নেমে এলাম কাছ থেকে বাঘ দেখতে। মনে হয় বাঘটা আট ফুটের কম ছিল না।

শেষ পর্যন্ত বাঘ-বাঘিনীর শহরে ঘর বাঁধার সাধ আর এ জীবনে মিটলই না।

ছবি / যুধাজিৎ সেনগুপ্ত
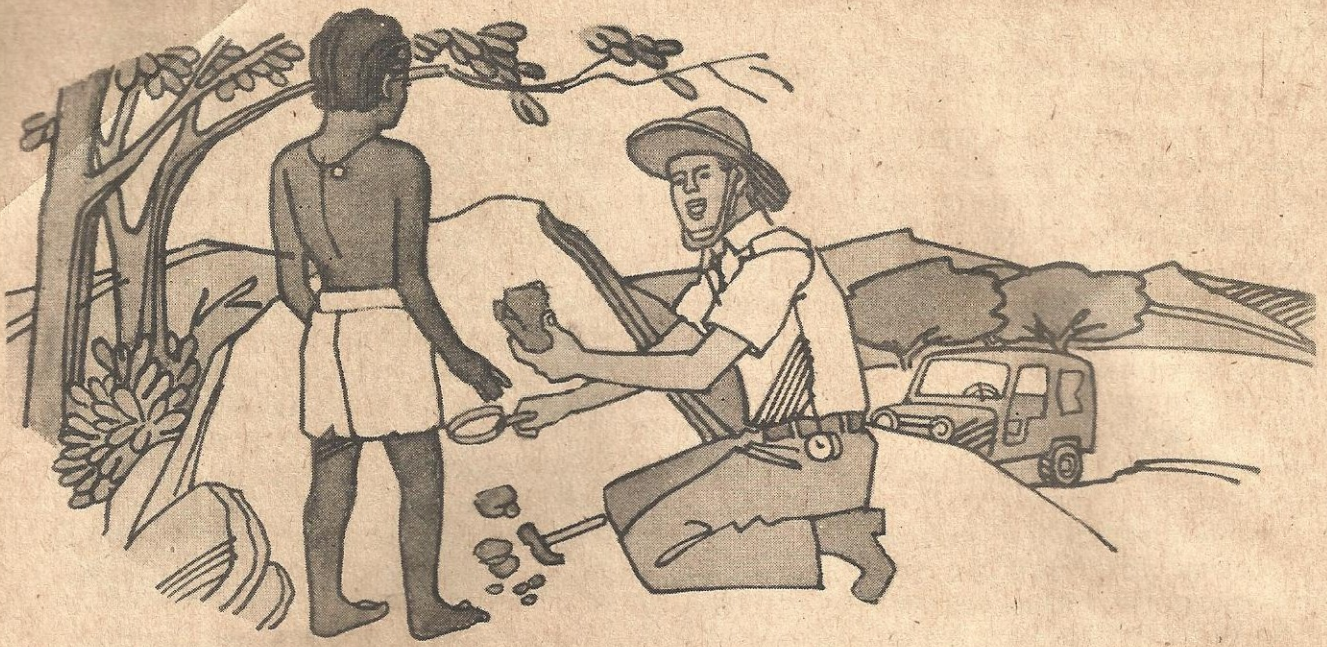
স্লেট পেনসিল

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দিনকয়েক যাবৎ নীলকমল স্কুলে যাচ্ছে না, মানে যেতে পারছে না। স্কুলে যেতে না পারার কারণ, হাত থেকে পড়ে ওর স্লেট ভেঙে গেছে, পেনসিলও ক্ষয়ে ক্ষয়ে এত ছোট হয়ে গেছে যে, আর লেখা সম্ভব নয়। এদিকে কেন্দাপাড়া গ্রামের পাঠশালার শিবু মাস্টারের কড়া হুকুম, স্লেট-পেনসিল না নিয়ে কেউ পাঠশালায় ঢুকতে পারবে না। পাঠশালা বলতে তো খড়ো চালার মাটির ঘর, বেশির ভাগ দিনই পাঠশালা বসে বাইরে গ্র্যানাইট পাথরের ডুংরির ওপরে। তবু স্লেট-পেনসিলের অভাবে পাঠশালায় না যেতে পেরে মুষড়ে পড়েছে নীলকমল। কারণ, পাঠশালায় পড়াশোনা করতে বেশ ভাল লাগে ওর। অবশ্য পেনসিল নিয়ে কোন সমস্যা নয়, দোকান থেকে অনায়াসে কিনে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু আসল মুশকিল স্লেট নিয়ে। বান্দোয়ানের দোকানে দরদস্তুর করে দেখেছে নীলকমল, একটা স্লেটের দাম পাঁচ সিকে, দাম কমালেও এক টাকা।

অথচ ওর বাবা গদাই মণ্ডলের এখন এক টাকা খরচ করে স্লেট কিনে দেবার ক্ষমতা নেই। গদাইয়ের নিজের জমি অল্প : তাই বারিদ মোড়লের জমিতে ভাগচাষ করে, বিনিময়ে জোটে কিছু টাকা আর খোরাকি হিসেবে ধান। টুকটাক নগদ টাকা সঞ্চয় যা ছিল, গেল মাঘ মাসে নীলকমলের দিদি লক্ষ্মীর বিয়ে দিতে গিয়ে গদাই মণ্ডল একেবারে ফতুর। গালুডিতে বিড়ির দোকানের মালিক জামাইবাবুর শখ ছিল একটা সাইকেলের, গদাই মণ্ডল ক্ষমতা না থাকলেও বিয়েতে যৌতুক দিয়েছে নগদ দুশো টাকা খরচ করে। ভাবী জামাইবাবুর জন্য পুরুলিয়ায় সাইকেল কিনতে গিয়ে একটা তিন চাকার সাইকেল খুব পছন্দ হয়েছিল নীলকমলের, কিন্তু সাইকেলের দোকানে বাবার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে সাহস করেনি। সাইকেলের দোকানে যখন কোমরের গেঁজে থেকে টাকা বের করে দোকানীকে দিচ্ছিল বাবা, তখন নীলকমলের মনে হল, যেন টাকা নয়, শরীরের হাড় ক'খানা গুনে দিচ্ছে।

অবশ্য দিদির বিয়েতে খুবই আনন্দ করেছিল নীলকমল। গালুডি থেকে বরযাত্রীর দল এসেছিল। হ্যাজাকের আলোয় কত রাত্তিরে বিয়ে হল, উলু দিল মেয়েরা, ভালমন্দ কত খাওয়া-দাওয়া—সব স্পষ্ট মনে আছে নীলকমলের। কিন্তু পরদিন বিকেলে দিদি যখন কেন্দাপাড়া ছেড়ে গালুডির দিকে রওনা দিল, তখন আচমকা মনটা দারুণ খারাপ হয়ে গেল। খুব কষ্ট হল দিদির জন্য, এত দুঃখ এই দশ-এগারো বছর বয়সের জীবনে কখনো পায়নি নীলকমল। এই পাহাড়ী জংলী গ্রাম কেন্দাপাড়া হঠাৎ যেন ফাঁকা হয়ে গেল। একেবারে ফাঁকা, নিঃসঙ্গ। নীলকমল বয়সে ছোট হলেও বুঝতে পারে, দিদির বিয়েতে বাবার যা কিছু সঞ্চয় ছিল, তা খরচ তো হয়েই গেছে, উপরন্তু মহাজনের কাছ থেকেও টাকা ধার করতে হয়েছে।

নীলকমল লক্ষ করে, দিদির বিয়ের পর থেকে বাবা কেমন যেন পালটে গেছে, সারাক্ষণ মনমরা, এদিকে আবার কী সব হিসেব কষে মনে মনে, আর পয়সা খরচ করে টিপে টিপে। কতদিন যে বাড়িতে মাছ খায় না। শুধু মাঝে একদিন ঝিল থেকে মৌরলা মাছ ধরে এনেছিল নীলকমল, সেদিনই যা একটু স্বাদ বদল। তবু বাবা-মাকে মোটামুটি খুশি মনে হয়, কারণ দিদি বেশ সুখে আছে, জামাইবাবুর বিড়ির দোকান থেকে ভালই নাকি আয়। পাঠশালার অঙ্ক ভাল মতন করতে না পারলেও এইটুকু বয়েস থেকে আয়-ব্যয়ের হিসেব বুঝে গেছে নীলকমল।

পাঠশালায় না গিয়ে আজ সকাল থেকে একলা একলা জঙ্গলে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায় নীলকমল। স্লেট-পেনসিল না নিয়ে পাঠশালায় গেলে শিবুমাস্টারের বেত আর রামচিমটির ভয়। এদিকে বাবার কাছে টাকা চাইবার উপায় নেই। কারণ নীলকমল বুঝে গেছে, স্লেট কিনবার টাকা চাইতে গেলে জবাব দেবে বাবা, 'লিখাপড়ির দরকার কী বটেক। উয়ার চাইতে বারিদের খেতিতে কাম করতি চল বটেক।

কিন্তু পড়াশোনা না করে খেতির কাজ করতে মন নেই নীলকমলের। ও লেখাপড়া শিখতে চায়। লেখাপড়া শিখতে পারলে দারোগাবাবুর চৌকিদার হতে পারবে। ওর খুব ইচ্ছে, বড় হয়ে পুলিস হবে। পুলিসের কত ক্ষমতা সবাই ভয় পায়। পুলিস হাত দেখালে বড় বড় গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে, বিনে পয়সায়

মিষ্টির দোকান থেকে সিঙাড়া-জিলেপি খাওয়া যায়, আরও কত কী!

বৈশাখের মাঝামাঝি রোদ খুব চড়া। সূর্য মাঝ-আকাশে পৌঁছতে বহু বাকি, তবু জংগলে পাহাড়ে ঘুরতে বেশ গরম লাগছে। সকালবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছে না খেয়ে, পেটের ভেতরে খিদেটা চনচনিয়ে উঠেছে। নীলকমল এদিক-ওদিক তাকায়। দূরে নীল রংয়ের দালমা পাহাড়। চারদিকে শাল, পিয়াল, মহুয়া, সেগুনের জংগল। মহুয়া গাছে প্রচুর হালকা হলুদ রংয়ের মহুয়া ফুল, টসটসে পাকা ফুলের গন্ধে সমস্ত জংগল ভরপুর। একটা ছোট পাহাড়ী নদী, গরমে সব জল শুকিয়ে গেছে। ছাড়া ছাড়া বেশ কিছু কেঁদ গাছ, তাতে পাকা কমলা হলুদ কেঁদ ফল, মাটিতেও অনেক পড়ে রয়েছে। মাটি থেকে গোটা কয়েক কুড়িয়ে মুখে দেয় নীলকমল। পাকা, বেশ মিষ্টি, সুন্দর স্বাদ। লক্ষ্মীদিদির কথা মনে পড়ে যায়। গরম-কালের দুপুরে কতদিন দুজনে গাছতলা থেকে পাকা কেঁদফল কুড়িয়ে খেয়েছে। কুড়িয়ে পাওয়া ফলের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে কত মন-কষাকষি। এখন মনে পড়ায় বুকের ভেতরে একটা ব্যথা টনটন করে ওঠে। গোটা কয়েক পাকা কেঁদফল হাতে নিয়ে টিলার ওপরে বসে থাকে নীলকমল। দিদির কথা ভাবে। চোখে জল ভরে আসে।

খানিকক্ষণ পরে কিসের আওয়াজে সম্বিৎ ফেরে নীল-কমলের। দেখতে পায়, নদীনালা, খানাখন্দ পেরিয়ে দূর থেকে একটা জিপ আসছে। জিপ! এখানে জিপ এলো কোত্থেকে! তবে কি পুলিসের জিপ। জিপ একটু কাছে এলে জিপের ছাই রং থেকে বুঝতে পারে নীলকমল, না পুলিসের জিপ নয়, পাথর সাহেবের জিপ। এতক্ষণে মনে পড়ে নীলকমলের। আরে, এই তো সেই কুইলাপালের ফরেস্ট বাংলোর পাথর সাহেব, জংগলে পাহাড়ে পাথরের খোঁজ করে বেড়ান। পাঠশালায় আসা যাওয়ার পথে পাথর সাহেবের এই জিপটা চোখে পড়েছে অনেকবার।

টিলা থেকে একটু দূরে জিপ থেকে নামেন জিওলজিস্ট বা ভূতাত্ত্বিক অরবিন্দ সোম। অবশ্য এ তল্লাটে গ্রামের লোকের কাছে ওঁর পরিচয় পাথর সাহেব। অরবিন্দ সোমের পরনে খাকি পোশাক, মাথায় টুপি, বেল্টে লাগানো ব্রানটন কমপাস, যা পাথরের আকৃতি-প্রকৃতি কিংবা গভীর জংগলের ভেতরে দিক নির্ণয় করতে কাজে লাগে। অরবিন্দ সোমের হাতে হাতুড়ি, পেছনে গাইড কুলি, পিঠে হ্যাভারস্যাক, কাঁধে জলের বোতল।

টিলার ওপর থেকে উৎসুক চোখে তাকিয়ে দেখে নীল-কমল, পাথর সাহেব এদিক ওদিক কী যেন খুঁজছেন। ওপাশে এক জায়গায় বিরাট বিরাট পাথরের দঙ্গল। ধূসর কালো রংয়ের পাথর, পরতে পরতে কে যেন সাজিয়ে রেখেছে। পাথর সাহেব ওরই একটা পাথরের গায়ে দমাদম মারতে শুরু করলেন হাতুড়ি দিয়ে। তারপর সেই পাথরের টুকরো আতস কাঁচের নীচে রেখে পরীক্ষা। পাথর সাহেব এত তন্ময় হয়ে কেন পরীক্ষা করছেন বনেজংগলে পড়ে থাকা এইসব অকিঞ্চিৎকর পাথর, ভেবে কূলকিনারা পায় না নীলকমল। এসব পাথর এত কী পরীক্ষা করবার আছে, কতদিন এই পাথরের ঢেলা ভেঙে পুকুরের জলে ব্যাঙবাজি খেলেছে ওরা। ওর মধ্যে এমন কী গুপ্তধনের সন্ধান পেলেন পাথর সাহেব, এই ভাবনা ওকে কৌতূহলী করে তোলে। এবার টিলা থেকে ধীরে ধীরে নীচে নেমে এসে দাঁড়ায় একেবারে পাথর সাহেবের শরীর ঘেঁষে।

সঙ্গের কুলি হাঁ হাঁ করে ওঠে, 'যা ভাগ বটি, ইখানে কি সারকস লাগতিছে বটে। যা, ভাগ—

অরবিন্দ সোম আতস কাঁচ থেকে চোখ তুলে তাকান ওর দিকে, হাসেন নরম চোখে। একটু ক্লান্ত অন্যমনস্ক গলায় প্রশ্ন করেন, 'কী নাম? কোন স্কুলে পড়? স্কুল যাওনি?'

'নীলকমল—' উত্তর দিতে গিয়ে নীলকমল চমকে ওঠে। তবে কি পাথর সাহেব জানতে পেরেছেন ওর পাঠশালায় না যাবার কথা। কিন্তু উনি কী করে জানবেন! ও তো বলেনি কাউকে। ভয়ভয় চোখে তাকায় পাথর সাহেবের দিকে।

অরবিন্দ সোম নীলকমলের দিকে তাকিয়ে দেখেন, একটি সাধারণ স্বাস্থ্যের গ্রাম্য বালক, পরনে ছেঁড়া হাফ প্যান্ট, কিন্তু অদ্ভুত টলটলে দুটি চোখ। যে চোখ অনেক কিছু জানতে চায়।

'জানো, এটা কী পাথর?' একটু থেমে আবার বলেন, 'এটা হল স্লেট-পাথর, অনেক রয়েছে এখানে। এই পাথরেই তো পাঠশালায় লেখাপড়া করো তোমরা। তাই না!'

পাথর সাহেবের কথায় নীলকমল সত্যিই স্তম্ভিত হতবাক। ওর মুখে কথা সরে না। কী শুনছে এসব। যে পাথর দিয়ে ব্যাঙবাজি খেলে ওরা, সেই পাথরেই কি আবার লেখাপড়া করে। আর ওদের গ্রামেরই কাছে রয়েছে এত স্লেট-পাথর। অথচ ওদের এত দাম দিয়ে শহর থেকে কিনতে হচ্ছে স্লেট-পাথর। সত্যিই, কী তাজ্জব ব্যাপার!

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে পাথর সাহেব কী বোঝেন জানে না, শুধু দেখে, কথা বলতে বলতে পাথর সাহেব একটা বড় পাথরের টুকরো হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে ভেঙে স্লেটের মাপে নিয়ে আসেন। পৃথিবীর সবচেয়ে অবিশ্বাস্য ব্যাপার এরপর নিজের চোখের সামনে ঘটতে দেখে নীলকমল।

স্লেট-পাথরের সাইজ করা বড় টুকরোটা ওর দিকে এগিয়ে ধরে বলেন অরবিন্দ সোম, 'নেবে, এই পাথরের টুকরোটা? লেখাপড়ার কাজ করতে পারবে? নেবে?'

এরপরও কী করে না নিয়ে পারে নীলকমল! আনন্দে ওর চোখে টলটল করছে জল। সেই জলে নীল আকাশের স্নিগ্ধ ছায়া, তাতে শিবুপণ্ডিতের বেতের ছবিটা নেই।

ছবি মদন সরকার

বাঘের খপ্পরে ভগবান

গঙ্গেশ বিশ্বাস

সন-তারিখ মনে নেই—অনেক দিন আগেকার কথা তো। একবার মৈপিঠে ভীষণ বাঘের উপদ্রব দেখা দিল। মৈপিঠ হল দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনার মধ্যে কুলতলি থানার একটি বড় গ্রাম। ডায়মণ্ডহারবার থেকে লঞ্চ আর বাসে চেপে যেতে হয় সেখানে। এই গ্রামের পূর্বে রয়েছে ঠাকুরান নদীর একটা ফ্যাকড়া—জোয়ারের সময় ফুলে উঠে বেশ চওড়া হয়, আবার ভাটার সময় শুকিয়ে গিয়ে সরু হয়ে পড়ে। তাছাড়া বর্ষা আর চোত-বোশেখের বাড়া-কমার ব্যাপার তো আছেই। নদীটার ঠিক পুবেই বৈঠাডাঙার রিজার্ভ ফরেস্ট। জঙ্গলটা যেমন গরান, বাণী, ক্যাড়া, সুন্দরী, গামা, হেঁতাল গাছে ভর্তি, সুন্দরবনী কেঁদো বাঘেও সেটা ছিল তেমনি ঠাসা। সুযোগ পেলেই রাত্রির অন্ধকারে দক্ষিণরায়ের এই বেয়াদব চেলারা কেউ কেউ ঠাকুরান পেরিয়ে চলে আসত মৈপিঠে, আর গরু-ছাগল-মানুষ, যখন যাকে পেত মুখে করে অনায়াসে নদী সাঁতরে আবার জঙ্গলে ফিরে গিয়ে ভোজ লাগাত মহানন্দে। যারা সদলে বৈঠাডাঙা-জঙ্গলে যেত কাঠকুটো ভেঙে আনতে, তাদের মধ্যেও কেউ-কেউ প্রাণ দিত বাঘের হাতে। সেখানকার বাঘগুলো ছিল এমনি বেপরোয়া যে দিনের বেলাতেও কোনো কোনো কাঠুরেকে সরাসরি আক্রমণ করে বসত।

যে বছর মৈপিঠে ভীষণ বাঘের উপদ্রব চলছিল, সেই বছরই ফাল্গুন মাসে ঐ গ্রাম থেকেই ভগবান, কাঙাল, নিতাই আর গোবরা—এই চারজন বৈঠাডাঙা জঙ্গলে গিয়েছিল কিছু কাঠ কেটে আনতে। গ্রাম থেকে জঙ্গল ছিল মাইল দেড়েক দূরে। একটা ডিঙিতে হাত-দা, দড়ি, কুড়ুল, মুড়ি আর ছোট ছোট মাটির ভাঁড়ে খাবার জল নিয়ে তারা যখন নদীর ওপারে জঙ্গলের ধারে পৌঁছল, বেলা তখন দশটা কি এগারোটা। নদীর ঠিক ধার থেকেই জঙ্গল শুরু। কিন্তু একেবারে বনের ধারে কাটার মত গাছ না পেয়ে ওরা একটা খালের মধ্য দিয়ে জোয়ার ধরে ডিঙিটাকে নিয়ে গেল বনের আরো সিকি মাইলটাক ভিতরে। বনের ভেতরটা ওদের মোটামুটি জানা ছিল। সেখানেই নেমে পড়ল তারা। খালের ওপর ঝুঁকে পড়া একটা গামা গাছের সঙ্গে ডিঙিটা বেঁধে রেখে ওরা উঠে এল একটা ধলের মধ্যে। ধল হচ্ছে বনের ভেতরে বড়-বড় ফাঁকা জায়গা। কোনো ধলে বাণী-গরানের চারা ছড়িয়ে থাকে, আবার ফুটা-ধলে মানুষের টাক-মাথার মত কোনো গাছই থাকে না। ভগবানদের এই ধলে ছিল বাণী-গাছের চারা। সম্পূর্ণ ধলটার ওপরে জমে ছিল একটা পুরু নুনের স্তর। বড় কোটালের সময় খালের নোনা জলে ডুবে যায় ধলটা ; রোদের তাপে সেই জল শুকিয়ে গেলে ধলের মাটিতে ফুটে ওঠে গুঁড়ো গুঁড়ো নুন ; এই ভাবে বছরের পর বছর ধলে জমতে থাকে নুনের স্তর।

চোত-বোশেখের দুপুরে নুনের জন্য ধলের জমি এমন তেতে ওঠে যে, তার ওপর দিয়ে তখন খালি পায়ে মানুষের পক্ষে হেঁটে চলা কঠিন হয়ে পড়ে। তখন ফাল্গুন মাস হলেও ধলের মাটি

বেশ তেতে গিয়েছে। খলের ওপারে ছিল বড় জঙ্গল ; কিন্তু এপারেও ছিল মেলাই বাণী-গরান-সুন্দরি। খলের এপারের জঙ্গলেই কাটার মত কয়েকটা গাছ ঠিক করে নিল তারা। গাছ বাছাই করতে গিয়ে তারা ছাড়াছাড়ি হয়ে পড়ল একজন থেকে আর একজন। তাদের মধ্যে আবার ভগবানের গাছটাই ছিল একটু বেশি দূরে—সব রকম গাছের ভিড়ও ছিল সেখানেই বেশি। তাহলেও ডাক দিলে আর তিনজন শুনতে পায় কি-না, তা তারা আগে থেকেই কুই-ডাক ডেকে বুঝে নিল—বনের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে কাঠুরে-শিকারী-মৌলিরা কেউ কারো নাম ধরে ডাকাডাকি করে না।

যারা কাঠ কাটে তাদের যেমন বলা হয় কাঠুরে, তেমনি যারা সুন্দরবনের মৌচাক ভেঙে মধু নিয়ে আসে তাদের বলা হয় মৌলি। ভগবান একটা গরান গাছ বেছে নিয়ে তাতে আট-দশটা কুড়ুলের কোপ বসাবার পরেই দেখতে পেল, তার সামনের দিকে প্রায় হাত পনেরো দূরে একটা কাঁটা ঝোপের ধারে মূর্তিমান যমের মত একটা বাঘ বসে আছে তার দিকে তাকিয়ে—বসে বসে মতলব আঁটছে কীভাবে তাকে আক্রমণ করবে। ভগবান গাছের পেছনে থাকায় জানোয়ারটা সরাসরি তার ওপর ঝাঁপিয়েও পড়তে পারছিল না। ভগবানেরও তখন কিছুই করার ছিল না। ছুটে পালাতে গেলে লাফিয়ে এসে বাঘ তার টুঁটি চেপে ধরবে। কুড়ুল বাগিয়ে সোজাসুজি বাঘটাকে চ্যালেঞ্জ জানানোও ছিল অসম্ভব, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুড়ুল সুদ্ধ তাকে ফেলে দেবে মাটিতে। তবে গাছে উঠে পড়তে পারলে যমটাকে ফাঁকি দিতে পারত ভগবান—এ-সব বাঘ গাছে উঠতে পারে না। কিন্তু মানুষ তো আর হনুমান নয় যে, এক লাফে গাছে উঠে পড়বে। গাছে উঠতে গেলেও বাঘটা ভগবানকে ধরে ফেলার সুযোগ পেয়ে যেত। তাই, মন্দের ভাল, বাঘটাকে দেখতে পেয়েই ভগবান গাছের আড়ালে এসে দাঁড়াল, যাতে জানোয়ারটা সরাসরি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারে। কিন্তু নখ-ছাল-লোম শূন্য এমন কোমল নরমাংসের লোভ বেশিক্ষণ দমন করেও থাকতে পারল না বাঘটা। মিনিট খানেক ভগবানকে সেইভাবে লক্ষ করতে করতে এক সময় ছুটে এসে ভগবানের বাঁ-কাঁধের আর হাতের জোড়ের জায়গায় কামড়ে ধরল, আর সামনের দিকের ডান পায়ের থাবা বসিয়ে দিল ভগবানের পিঠের বাঁ-দিকে। দারুণ বিপদের মধ্যে পড়েও ভগবান হাল ছাড়ল না ; সেই অবস্থাতেই বাঁ-হাত দিয়ে শক্ত করে গরান গাছটা জড়িয়ে ধরে ডান হাত দিয়ে বাঘটার পিঠে যতটা সম্ভব জোরে কুড়ুলের কোপ মারতে লাগল একটার পর একটা। কিন্তু গাছকাটা কুড়ুল যে এক হাতে চালানো কেমন অসুবিধার কাজ, যে তেমন কুড়ুল হাতে নিয়েছে, সে তা সহজেই বুঝতে পারবে। ভগবানের অনেক জঙ্গলের অভিজ্ঞতা ছিল, অনেকবার এর-তার সঙ্গে শিকারেও গিয়েছে ; কিন্তু এরকম বিপদে পড়েনি কখনো। সে ঐ ভাবে বাঘের পিঠে ডান হাত দিয়ে কুড়ুলের কোপ বসাতে-বসাতেই চিৎকার করে বলতে লাগল, "এই তোরা কোথায়, আমাকে বাঘে খেয়ে ফেলল রে ! মরে গেলাম, মেরে ফেলল, মেরে ফেলল !"

বাঘটা কিন্তু কুড়ুলের কোপ খেয়েও ভগবানকে ছাড়ছে না, কেবল গর-গর গোঁ-গোঁ শব্দ করছে। ভগবানের চিৎকার শুনে কাঙালরা তিনজনেই ছুটে এসে দেখে ভগবান আর বাঘের লড়াই চলছে। নিতাই আর গোবরা ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকল কাঠ হয়ে। কাঙাল সাহসী লোক। সেও ভগবানের সঙ্গে অনেক শিকারে গিয়েছে শিকারীদের সাহায্য করতে। সে ছুটে এসে দু-হাতে কুড়ুল তুলে বাঘটার মোটা ঘাড়ের ওপর মারল প্রচণ্ড এক কোপ ; কিন্তু কুড়ুলটা বাঘটার ঘাড়ের হাড়ে এমনভাবে বসে গেল যে কাঙাল সেটা আর তুলতেই পারল না সেখান থেকে। কাঙালের সেই অবস্থা দেখে নিতাই এবার এগিয়ে এসে কাঙালের কুড়ুলের পাশে বসিয়ে দিল আর এক কোপ। ফলে কাঙালের কুড়ুলটা গেল খুলে—দু-জন মজুরে মিলে কাঠ চেরাইয়ের সময় যেভাবে কুড়ুল বসায় আর ওঠায়, ঠিক সেই রকম আর কি। বাঘটা তখনো দাঁত বসিয়েই রেখেছে ভগবানের কাঁধে—আশ্চর্য তার জেদ আর লোভ। বাঘটা ভগবানকে কামড়ে ধরার পর থেকেই গোঁ-গোঁ করে গজরাচ্ছিল। কাঙালের এক কোপ খেয়েও তার গজরানি থামেনি। কিন্তু নিতাইয়ের কোপ পড়তেই বন্ধ হল তার গজরানি। ভগবান তখন নিজের আর বাঘের রক্তে স্নান করছে। পর পর তিন-চারটে কুড়ুলের কোপ পড়তে বাঘের গলা যখন দু-ফাঁক হতে আর অল্পই বাকি, ভগবান আর বাঘ, দুজনেই পড়ে গেল মাটিতে। ভগবানের আর তখন জ্ঞান নেই।

কাঠ কাটা পড়ে থাকল। তাড়াতাড়ি ভগবানকে ধরাধরি করে ডিঙিতে এনে তুলল কাঙালরা তিনজনে। কোনরকমে বাঘটাকে তোলা হল ডিঙিতে। পরে দেখা গেল, সেটা বাঘ নয়, বাঘিনী ; তাই বোধ হয় তার তেজ ছিল ঐ রকম সাংঘাতিক ! ঘন্টাখানেকের মধ্যে ভগবানকে নিয়ে যাওয়া হল মহকুমা শহরে, সেখান থেকে আবার কলকাতায়।

মাসখানেক বাদে ভগবান ফিরে এল গ্রামে। তার বাঁ-হাতটা কেটে বাদ দিতে দিতেও শেষ পর্যন্ত রেহাই পেয়েছে। কিন্তু হাতটা টিকে গেলেও সেটা প্রায় বিকল হয়েই রইল।

শুধু ভগবান নামটার জন্যই বোধ হয় একটা ভয়াবহ বাঘের খপ্পরে পড়ে গিয়েও সেবার প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল ভগবান।

ছবি বিমল দাশ